শিশির ভট্টাচার্য্য

সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব: পটভূমি ও বিবর্তন

আলোচনার শুরুতে ধরে নেয়া যাক, শব্দকোষ আর ব্যাকরণ – এই দুয়ে মিলে ভাষা। ব্যাকরণের অন্যতম কাজ হচ্ছে: ১. শব্দ গঠন করা, ২. গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করা এবং ৩. গঠিত শব্দ ও বাক্য উচ্চারণের ব্যবস্থা করা। ধরা যাক, ব্যাকরণ হচ্ছে মানব-মস্তিষ্কের একটা মডিউল এবং এর কমপক্ষে তিনটি সাবমডিউল আছে: ১. রূপতত্ত্ব (Morphology), ২. বাক্যতত্ত্ব (Syntax) এবং ৩. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)। রূপতাত্ত্বিক মডিউলে শব্দ গঠিত হয়। রূপতাত্ত্বিক মডিউলে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্যতাত্ত্বিক মডিউলে বাক্য গঠিত হয়। গঠিত শব্দ ও বাক্য উচ্চারণের ব্যবস্থা নেয় ধ্বনিতাত্ত্বিক মডিউল।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় ধ্বনিতত্ত্বের বিশেষ একটি মডেলের উপর আলোকপাত করা হবে: **সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব**। জ্ঞানচর্চার জগতে প্রতিটি মডেলের উৎপত্তির একটি পটভূমি থাকে। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার আগে আমরা এর পটভূমিটির একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দেবো। আমরা জানি, প্রতিটি মডেল এক একটি থিসিস এবং কোনো মডেল, কোনো থিসিস শুধু ভুল প্রমাণ করা যায়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একটি thesis উপস্থাপনের পর অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেই থিসিসের দুর্বলতাগুলো তুলে ধরে একটি antithesis উপস্থাপন করে। এর পর অন্য এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী thesis আর antithesis মিলিয়ে একটি synthesis দাঁড় করাতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞানচর্চার এই প্রচলিত ধারা অনুসরণ করে সঞ্জননী ব্যাকরণ ঘরানার অনুসারী এবং বিরোধী– এই উভয় পক্ষের বৈয়াকরণেরা সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের কিছু সমস্যা তুলে ধরেছেন। বিকল্প মডেলেরও প্রস্তাব করেছেন কেউ কেউ। বর্তমান আলোচনায় এই সমস্যাগুলোর কথা বলা হবে এবং বিকল্প মডেলগুলোর অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দেয়া হবে।

২. উচ্চারণের একক: অক্ষর ও প্রণব

'মা' আর 'রাগ' এই দুটি শব্দেই একটি মাত্র অক্ষর (Syllable)। 'মালা' শব্দে দুই অক্ষর: 'মা' এবং 'লা'। কাকে বলে অক্ষর? কোনো যতি বা বিরতি না দিয়ে অনায়াসে যে ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারণ করা যায় তাকেই বলা যাক 'অক্ষর'। অক্ষর একটি উচ্চারণ একক। অক্ষরকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাবো ধ্বনি। 'মা' শব্দটিতে দুটি ধ্বনি রয়েছে: 'ম' এবং 'আ'। 'রাগ' শব্দটিতে আছে তিনটি ধ্বনি: 'র', 'আ' এবং 'গ'। অক্ষরের দুটি অংশ: সূচনা (onset) আর ছন্দ (Rhyme)। ছন্দের দুটি অংশ: কেন্দ্র (Nucleus) আর উপধা (Coda)। 'রাগ' শব্দের 'র' আছে সূচনায়, 'আ' আছে কেন্দ্রে এবং 'গ' আছে উপধায়। 'মা' শব্দের 'ম' আছে সূচনায়, 'আ' আছে কেন্দ্রে।

প্রমিত ইংরেজি ভাষার শব্দ Top আর Pot এর উচ্চারণের তুলনা করলে দেখা যাবে এই দুই শব্দে T ধ্বনির উচ্চারণ এক নয়। Top শব্দে T মহাপ্রাণ, কিন্তু Pot শব্দে অল্পপ্রাণ। একই ধরণের কথা বলা যাবে P ধ্বনি সম্পর্কেও: Top শব্দে P অল্পপ্রাণ, কিন্তু Pot শব্দে মহাপ্রাণ। এখন আমরা কি বলবো যে ইংরেজিতে দুটি আলাদা T বা P রয়েছে, যার একটি মহাপ্রাণ এবং অন্যটি অল্পপ্রাণ? একই ধরণের অন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক। বাংলা 'মা' এবং 'মার' শব্দে যে দুটি 'আ' ধ্বনি রয়েছে তাদের দৈর্ঘ সমান নয়। আমরা কি তাহলে বলবো যে বাংলায় দুটি আলাদা 'আ' ধ্বনি আছে?

এবার অন্য ধরনের একটি সমস্যার দিকে নজর দেয়া যাক। বাংলা 'বাঘ' শব্দের বানানের সাথে এর উচ্চারণের মিল নেই। আমরা মহাপ্রাণ বর্ণ দিয়ে 'বাঘ' লিখলেও উচ্চারণ করি 'বাগ'। 'শাহবাগ' বা

'গোলাপবাগ'-এর 'বাগ' এর সাথে এর উচ্চারণের এতটুকুও তফাৎ নেই। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে অক্ষরের উপধা বা কোডায় 'ঘ' ধ্বনিটি 'গ' হিসেবে উচ্চারিত হচ্ছে, অন্যত্র হচ্ছে না। যেমন, 'বাঘের' বলার সময় আমরা 'বাগের' বলি না, কারণ 'বাঘের' শব্দে 'ঘ' অক্ষরের উপধায় নেই, আছে সূচনা বা অনসেটে। এমনিতে বাংলায় 'ঘ' আর 'গ' আলাদা ধ্বনি: 'ঘা' এবং 'গা' এক কথা নয় মোটেই। কিন্তু অক্ষরের উপধায় 'গ' আর 'ঘ' এর পার্থক্য বজায় থাকে না। তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে কোনো কোনো প্রতিবেশে (Context) 'ঘ' আর 'গ' এক কথা?

এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে 'ফোনেটিক' আর 'ফনোলজি' – এই দুই আলাদা শাস্ত্রের শরণাপন্ন হতে হবে আমাদের। ফোনেটিশিয়ান বা ধ্বনিবিজ্ঞানী বলবেন: হ্যাঁ, ঠিকইতো, মনোসিলাবিক বা একাক্ষর 'বাঘ' শব্দে অক্ষরের সূচনায় 'গ' আছে, 'ঘ' নয়। Pot শব্দ শুরু হচ্ছে মহাপ্রাণ P দিয়ে, আর শেষ হচ্ছে অল্পপ্রাণ P দিয়ে। উচ্চারণের এই পার্থক্য কানে শোনা যাচ্ছে, সন্দেহ হলে স্পেক্টোগ্রাম করে যাচাই করে নেয়া যাচ্ছে। ফোনেটিশিয়ানের কাছে প্রতিটি ধ্বনিই একটি উচ্চারণ একক। কিন্তু ফনোলজিস্ট বা ধ্বনিতাত্ত্বিক দুই P-কে বা দুই 'আ'-কে আলাদা সত্তা ঘোষণা করার আগে দুবার ভাববেন। ফনোলজির লক্ষ্য হচ্ছে, যে সিস্টেম বা সংশ্রয়ের কারণে উচ্চারণ প্রক্রিয়া সম্ভবপর হচ্ছে সেই সংশ্রয়কে বর্ণনা করা। কোনো সংশ্রয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা রিডান্ড্যান্ট (Redundant) কিছু থাকতে পারবে না। যদি একটা P দিয়ে কাজ চলে যায় তবে দুই দুটি P কখনই মেনে নেবে না ফনোলজি।

এই একটা P হবে উচ্চারণের ন্যূনতম একক, যাকে কাঠামোবাদী বা গ্রন্থনবাদী (Structuralist) ধ্বনিতত্ত্বে বলা হয় 'ফোনিম' (Phoneme)। বাংলার 'গ' এবং 'ঘ' স্বতন্ত্র দুটি ফোনিম। দুটিই 'অর্গলিত' (Occlusive/Stop) ফোনিম, যার মানে হচ্ছে, এ দুটি ফোনিম উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে আসা বাতাস মুখগহ্বরে অর্গলিত বা বাধাগ্রস্ত হয়। দুটিই কণ্ঠ্য (Velar) ফোনিম, অর্থাৎ সেই বাধাগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারটা ঘটে মুখগহ্বরের পেছন দিকে, কণ্ঠনালীর কাছাকাছি এলাকায়। সুতরাং দুটি প্রণবেরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: [+ অর্গলিত, + কণ্ঠ্য]। 'গ' এর সঙ্গে 'জ' এর তুলনা করা যাক। 'গ' যদি [+ অর্গলিত] হয়, তবে 'জ' হবে [– অর্গলিত]। এর মানে হচ্ছে, 'জ' উচ্চারণের সময় মুখগহ্বর 'অবারিত মাঠ', ফুসফুস-নিঃসারিত বাতাস মুখগহ্বরের অভ্যন্তরে অতটা বাধাগ্রস্ত হয় না। [– অর্গলিত] না বলে বলা যেতে পারে [+ অবারিত]। সেক্ষেত্রে 'গ' হবে [– অবারিত]। 'গ' ফোনিমকে বর্ণনা করার সময় বলতে হবে হয় [+ অর্গলিত], নয়তো [– অবারিত]। দুটো একসঙ্গে বলার প্রয়োজন নেই। বললে 'বাহুল্যদোষ' (Redundancy) ঘটবে।

[+/– অবারিত] বা [+/– অর্গলিত] ইত্যাদি হচ্ছে প্রণবের স্বলক্ষণ (Feature)। অন্তত একটি স্বলক্ষণ আলাদা হলে একটি প্রণব অন্য একটি প্রণবের চাইতে আলাদা বা স্বতন্ত্র হয়ে যায়। সেই স্বলক্ষণটিকে বলা যেতে পারে 'স্বাতন্ত্র্যসূচক স্বলক্ষণ' (Distinctive feature)। 'গ' ও 'ঘ' এর স্বাতন্ত্র্যসূচক স্বলক্ষণ হচ্ছে [+/– মহাপ্রাণ]। 'গ' হচ্ছে [– মহাপ্রাণ] আর 'ঘ' হচ্ছে [+মহাপ্রাণ]। প্রতিটি প্রণবকে অনেকগুলো স্বলক্ষণের এক একটি গুচ্ছ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে; প্রতিটি প্রণবকে বিশ্লেষণ করলে মিলবে একাধিক স্বলক্ষণ। এই স্বলক্ষণগুলোর কারণেই হয়তো কোনো একটি প্রণব 'গ' বা অন্য একটি প্রণব 'প' হিসেবে উচ্চারিত হয়ে উঠতে পারে, অথবা প্রণবগুলো উচ্চারিত হলে শ্রোতার কানে সেগুলোকে 'গ' বা 'প' বলে মনে হয়। স্বলক্ষণ দুই প্রকার: উচ্চারণগত (Articulatory) ও শ্রবণগত। [+/– অবারিত] বা [+/– অর্গলিত] উচ্চারণগত (Articulatory) স্বলক্ষণ; [+/– মহাপ্রাণ] শ্রবণগত (Accoustic) স্বলক্ষণ।

কোনো প্রণবের প্রতিটি স্বলক্ষণই অন্য কোনো প্রণবের সাথে সেই প্রণবটির হয় ঐক্য, নয়তো স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করে। যেমন, 'গ' ও 'ঘ' এর স্বলক্ষণগুচ্ছের মধ্যে [+ অর্গলিত] স্বলক্ষণটি পাওয়া যাবে। এই স্বলক্ষণটি 'গ' ও 'ঘ'-এর ঐক্যের পরিচায়ক। আবার 'ঘ' এর [+মহাপ্রাণ] স্বলক্ষণটি 'গ' এর সঙ্গে এর স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। একইভাবে 'জ' আর 'গ' এর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে এদের উভয়ের [+মহাপ্রাণ] স্বলক্ষণের কারণে। আবার এদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটা বোঝা যাবে 'জ' এর [+ অর্গলিত] এবং 'গ' এর [– অর্গলিত] স্বলক্ষণের কারণে। 'প্রণব' বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি: 'স্বাতন্ত্র্যসূচক স্বলক্ষণ বা বৈশিষ্টযুক্ত ধ্বনি-একক'। কোনো ধ্বনিকে প্রণব হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হলে সেই প্রণবটির সাথে অন্য একটি প্রণবের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে হবে। সাধারণত ন্যূনতম শব্দজোড় ব্যবহার করে দুটি প্রণবের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করা হয়। যেমন, 'গা/ঘা' একটি ন্যূনতম শব্দজোড়। 'গ/ঘ' পার্থক্যের কারণে এই দুটি শব্দের মধ্যে অর্থপার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং 'গ' ও 'ঘ' প্রমিত বাংলার দুটি আলাদা প্রণব।

'প্রণব' একটি বিমূর্ত একক যেটি প্রতি উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, যদিও সেই রূপগুলো একটিমাত্র এককেরই প্রতিনিধিত্ব করে। ইংরেজির দুই 'প' বা বাংলার দুই 'আ'-এর মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্য প্রাণবিক (Phonemic) নয়, কারণ এই দুই 'প' বা দুই 'আ' এর কোনো শব্দজোড়ে অর্থবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। দুই 'প' বা দুই 'আ' এর মধ্যে পার্থক্য উপপ্রাণবিক (Subphonemic)।

৩. ফার্দিনঁ দ্য সোস্যুর ও জেনেভা স্কুল

অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকের প্রথম দিকে 'ফোনিম' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন দ্যুফ্রিশ-দেজেনেত (A. Dufriche-Desgenette) নামে ফরাসি ভাষাবিজ্ঞান সমিতির এক সদস্য ভাষাবিজ্ঞানী। এঁর সম্পর্কে বেশি কিছু তথ্য জানা যায় না, আদ্যাক্ষরটি ছাড়া বাপমায়ের দেয়া পুরো নামটি পর্যন্ত কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ হয়নি। তিনি জার্মান Sprachlaut (উচ্চারণ: 'স্প্রাখলাউট', অর্থ: 'ভাষার ধ্বনি') এর ফরাসি প্রতিশব্দ তৈরি করেছিলেন Phonème (ফরাসি উচ্চারণ: 'ফোনেম')। সুতরাং দ্যুফ্রিশ-দেজেনেতের কাছে 'ফোনিম' ছিল 'ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলোর একটি সাধারণ নাম'। এর পর অনেকেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তবে ভিন্ন অর্থে। ফার্দিনঁ মোঁজ্যাঁ দ্য সোস্যুরের (Ferdinand Mongin de Saussure) (১৮৫৭-১৯১৩) মাস্টার্স থিসিসে (১৮৭৮) শব্দটির অর্থ ছিল: 'কোনো প্রত্নভাষার এমন একটি (কাল্পনিক) ধ্বনি যেটি কন্যা ভাষাগুলোতে (সে যুগে ধরে নেওয়া হতো যে প্রতিটি আধুনিক ভাষার এক বা একাধিক পূর্বপুরুষ আছে) ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে'। উদাহরণ: সংস্কৃত 'য়ামা' শব্দের 'য়' বাংলায় 'জ' এবং চট্টগ্রামিতে 'য' হিসেবে উচ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে মাস্টার্স থিসিস রচনারত 'শিক্ষার্থী' সোস্যুরের 'য়' হচ্ছে একটি ফোনিম।

জেনেভায় শিক্ষকতাকালীন সময়ে (১৯০৭-১৯১১) 'শিক্ষক' সোস্যুরের 'ফোনিম' সম্পর্কে ধারণা ছিল এরকম: "Le phonème est la somme des impressions acoustiques et des mouvements articulatoires, de l'unité entendue et de l'unité parlée, l'une conditionnant l'autre: ainsi c'est déjà une unité complexe, qui a un pied dans chaque chaîne. (Saussure 1915: 65)... On parle de P comme on parlerait d'une espèce zoologique; il y a des exemplaire mâles et femelles, mais pas d'exemplaire idéal de l'espèce." (Saussure 1915:82) "প্রণব হচ্ছে শ্রবণগত অনুভূতি আর উচ্চারণ-অঙ্গের সঞ্চালনের সমষ্ঠি। পরস্পরকে প্রভাবিত করে এমন একটি শ্রবণ-একক ও একটি বাচন-এককের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি প্রণব। উচ্চারণ আর শ্রবণ– এই দুই নৌকায় পা দিয়ে থাকা এই এককটি শুরু থেকেই বেশ জটিল একটি সত্তা।... আমরা এমনভাবে (প্রণব) P এর কথা বলি, যেমন করে (প্রাণীবিজ্ঞানে) কোনো বিশেষ প্রজাতির প্রাণীর কথা বলা হয়– সেখানে পুরুষ আর মাদী প্রাণীর উদাহরণ থাকে, কিন্তু আদর্শ প্রাণীটির

কোনো উদাহরণ থাকে না।" সুতরাং শিক্ষক সোস্যুরের কাছে প্রণব হচ্ছে একটি বিমূর্ত সত্তা যেটি প্রতি উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বাস্তবায়িত হয়, যদিও সেই রূপগুলি একটিমাত্র এককেরই প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, ছাত্র সোস্যুর আর শিক্ষক সোস্যুরের প্রণবের ধারণা এক নয়।

৩. কুর্তনে, ক্রুজজেভস্কি ও কাযান স্কুল

সোস্যুর সম্ভবত প্রণবের উপরোক্ত ধারণাটি পেয়েছিলেন জন্যে রাশিয়ার কাযান স্কুলের দুই পুরোধা ভাষাবিজ্ঞানী জঁ বোদুয়্যাঁ দ্য কুর্তনে (Jan Baudouin de Courtenay) (১৮৪৫-১৯২৯) এবং তাঁর ছাত্র-সহকর্মী মিকোলাই ক্রুজজেভস্কির (Mikolaj Kruszeweski) (১৮৫১-১৮৮৭) রচনায়। কুর্তনে ও ক্রুজজেভস্কি দুজনেই জাতিগতভাবে পোলিশ ছিলেন, তবে কুর্তনের পরিবারের আদি নিবাস ছিল ফ্রান্সে। সোস্যুরের সঙ্গে এঁদের দুজনেরই যোগাযোগ ছিল। ১৮৮১ সালে ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক সমিতির এক সভায় কুর্তনের সাথে সোস্যুরের সাক্ষাৎ হয়। ১৮৮০ সালে ক্রুজজেভস্কি সস্যুরের মাস্টার্স অভিসন্ধর্ভের একটি নীরিক্ষা রচনা করেছিলেন যাতে তিনি লেখকের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। মনে করা হয় যে সোস্যুরের মাস্টার্স অভিসন্ধর্ভ পড়েই ক্রুজজেভস্কি 'ফোনিম' শব্দটির সাথে পরিচিত হন এবং পরে ভিন্ন অর্থে (যে অর্থে বর্তমানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়) শব্দটি ব্যবহার করেন। সোস্যুর নিজেও কুর্তনে ও ক্রুজজেভস্কির রচনার সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি নাকি এই দুই জনের রচনার প্রশংসা করে লিখেছিলেন (দ্র. Godel 1957:51): (এন্ডারসনের ইংরেজি অনুবাদের মৎকৃত বঙ্গানুবাদ) 'নিখাদ ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে 'ভাষা' (Langue) নামক সত্তাটির তাত্ত্বিক ধারণার এত কাছাকাছি আর কেউ যেতে পারেননি।' ধারণা করা হয় যে সোস্যুরের অনেক আগেই কুর্তনে ও ক্রুজজেভস্কি 'ফোনিম'-এর আধুনিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন।

ক্রুজজেভস্কি নিজের মাস্টার্স থিসিসে শিক্ষার্থী সস্যুরের ফোনিমের ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন, তবে একটু ভিন্নভাবে। ক্রুজজেভস্কির মতে, প্রণব হচ্ছে (একই ভাষার) রূপমূলের এমন কিছু ধ্বনি যেগুলো প্রতিবেশভেদে বদলে যায়। রূপমূলের পরিবর্তনশীল ধ্বনিই হচ্ছে প্রণব। একাধিক ধরনের প্রতিবেশ রয়েছে। বাংলা থেকে উদাহরণ দেয়া যাক।

প্রথম উদাহরণগুচ্ছ: 'গোলাবজল' ও 'ডাকঘর'। প্রথম শব্দে প্রাতিপাদিক (Nominal base) 'গোলাপ'-এর 'প' প্রণবটি 'ব'-তে পরিণত হচ্ছে। 'ডাকঘর' শব্দে প্রথম প্রাতিপদিক 'ডাক' এর 'ক' প্রণব পরিণত হচ্ছে 'গ'-তে। ক্রুজজেভস্কির ব্যাখ্যা হবে: একই P বা K-প্রণব যথাক্রমে 'ব' ও 'গ'-তে পরিবর্তিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় উদাহরণগুচ্ছ: 'বাঘ' (উচ্চারণ 'বাগ') এবং 'বাঘের'। এক্ষেত্রে ক্রুজজেভস্কির ব্যাখ্যা হবে: একই G-প্রণব 'বাঘ' প্রাতিপদিকের শেষে অল্পপ্রাণ 'গ'-তে পরিণত হচ্ছে, কিন্তু 'বাঘের' শব্দে 'ঘ'-ই থাকছে স্বরাগ্রবর্তী {-এর} প্রত্যয়ের সাথে।

তৃতীয় উদাহরণগুচ্ছ: 'হাসতো' এবং 'সন্ত্রস্ত'। 'হাসতো' শব্দের উচ্চারণে 'হাসি' প্রাতিপদিকের তালব্য (Palatal) /s/ বহাল আছে। 'সন্ত্রাস' প্রাতিপদিকের দ্বিতীয় তালব্য /s/-টা 'সন্ত্রস্ত' শব্দে (উচ্চারণে) দন্ত্য (Dental)/s/-তে পরিণত হচ্ছে, কিন্তু 'সন্ত্রাসী' শব্দে একই থাকছে। ক্রুজজেভস্কির ব্যাখ্যা হবে: একই S-প্রণব বিশেষ রূপতাত্ত্বিক (Morphological) প্রতিবেশে বদলে যাচ্ছে: {-তো}-প্রত্যয়ের সাথে দন্ত্য /s/ আর {-ই} প্রত্যয়ের সাথে তালব্য /s/।

ক্রুজজেভস্কি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং উদাহরণ সহযোগে এই পরিবর্তনগুলো ব্যাখ্যা করেন (রূশ ভাষায় লেখা এবং ১৮৮১ সালে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত) তাঁর মাস্টার্স থিসিসে। উপরোক্ত ধ্বনিপরির্তনগুলোকে ক্রুজজেভস্কি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন: প্রথম শ্রেণীর ধ্বনিপরিবর্তনের চারটি বৈশিষ্ট্য আছে: ১. এই ধ্বনিপরিবর্তনগুলো ব্যতিক্রমহীন; ২. প্রতিবেশ-নির্বিশেষে এগুলো কার্যকর হয়; ৩. ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ দৃশ্যমান এবং ৪. মূল ধ্বনি ও পরিবর্তিত ধ্বনি নৃ-ধ্বনিগতভাবে (Anthropophonically) খুবই কাছাকাছি, অর্থাৎ তাদের মধ্যে অতি সামান্য ধ্বনিগত পার্থক্য থাকে। যেমন, ১নং ও ২নং উদাহরণের ক>গ, প>ব, শ>স ইত্যাদি ধ্বনির মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক নেই, একটিমাত্র স্বলক্ষণের পার্থক্য আছে।

উপরে উল্লেখিত 'গোলাপজল', 'বাঘ' ইত্যাদি ১ম শ্রেণীর ধ্বনিপরিবর্তন। 'বাঘ' শব্দের উচ্চারণ 'বাগ', কারণ এখানে 'গ' রয়েছে অক্ষরের উপধায়। 'গোলাপজল' শব্দে 'গোলাপ'-এর উচ্চারণ 'গোলাব', কারণ 'প' ধ্বনির অব্যবহিত পরে ঘোষ 'জ' ধ্বনি থাকাতে 'প' এর ঘোষীভবন হচ্ছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ধ্বনিপরিবর্তনগুলো ১. ব্যতিক্রমহীন নয়, ২. রূপতাত্ত্বিক প্রতিবেশ-নির্ভর, ৩. এসব ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ দৃশ্যমান নয় (এমনও হতে পারে যে পরিবর্তনের কারণ সংশ্লিষ্ট ভাষার বিবর্তনে নিহিত) এবং ৪. মূলধ্বনি ও পরিবর্তিত ধ্বনির মধ্যে এমন অস্বাভাবিক পার্থক্য থাকতে পারে যা অন্য কোনো ভাষায় সাধারণত পাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ,শ>স, বা ঘ>গ অতি স্বাভাবিক এক একটি পরিবর্তন। কিন্তু 'যাই, যাবো, যাওয়া, গিয়েছি, গেলাম...' ক্রিয়ারূপগুলোতে য>গ বা গ>য তুলনামূলকভাবে অস্বাভাবিক পরিবর্তন (যদি এটা আদৌ কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে!)। এ পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গেলে ঐতিহাসিক ব্যাকরণের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ক্রুজজেভস্কি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য করেননি। এটুকু বলা যেতে পারে যে তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্তন দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনের তুলনায় বেশি প্রতিবেশ-নির্ভর, বেশি অস্বাভাবিক, কম ব্যতিক্রমহীন। যেমন ধরা যাক, স্বরপরিবর্তনের নিয়ম (সংস্কৃতে যেগুলোকে বলে গুণ-বৃদ্ধির নিয়ম) বাংলায় কমবেশি কার্যকর হয়: গুরু/গৌরব, নীতি/নৈতিক, সর্বক্ষণ/সার্বক্ষণিক...। কিন্তু এর ব্যতিক্রম আছে: পেট/*পৈটিক, **ভীতি/*ভৈতিক** (* চিহ্নের অর্থ হচ্ছে, শব্দগুলো গ্রহণ-অযোগ্য)। গুণ-বৃদ্ধির নিয়ম যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়ম হয়, তবে 'যাই/গেলাম' (বা ইংরেজির go/went হবে তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্তন।

ক্রুজজেভস্কির কাছে ফোনিম, রূপতত্ত্ব আর ধ্বনিপরিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কারণ যে ধ্বনি-একক নিছক রূপতাত্ত্বিক কারণে একাধিক রূপ ধারণ করে তাকে 'ফোনিম' বা প্রণব বলেছেন কুজজেভস্কি। ধ্বনি-এককের পরিবর্তনের কথা অবশ্য কুর্তনে তাঁর সেন্ট পিটার্সবার্গ (লেনিনগ্রাদ) আর কাযান বক্তৃতায় অনেক আগেই উল্লেখ করেছিলেন। কুর্তনের মতে (১৮৯৫ [১৯৭২]:১৫৯) ধ্বনিপরিবর্তন হচ্ছে: "ব্যুৎপত্তিগতভাবে সম্পর্কিত দুটি রূপমূলের মধ্যে ধ্বনিগত বা ফোনেটিক পার্থক্য"। কুর্তনে মনে করতেন, 'প্রণব' নামক এককটি হচ্ছে একাধিক মূর্ত ধ্বনিপরিবর্তনের সমষ্টির বিমূর্ত প্রতিরূপ। তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে বলে গেছেন: 'প্রণব হচ্ছে ভাষার ধ্বনিগুলোর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরূপ' (Psychological equivalent of a speech sound)। তিনি আরও বলেছেন: বক্তার উদ্দেশ্য থাকে সেই বিশেষ প্রতিরূপটি ('A sound of the same intention') উচ্চারণ করা। কিন্তু উদ্দেশ্য অভিন্ন থাকলেও (প্রতি উচ্চারণে) ভিন্ন ভিন্ন (different anthropophonic realization) নৃ-ধ্বনিগত বাস্তবায়ন হয়। আমরা উপরে দেখেছি, শিক্ষক সোস্যুরও প্রায় একই ধারণা পোষণ করতেন এবং আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, ধারণাটি সম্ভবত তিনি পেয়েছিলেন কুর্তনে ও ক্রুজজেভস্কির কাছ থেকে।

কুজজেভস্কির অকালমৃত্যুর পর কুর্তনে প্রণবের উপর তাঁর নিজের গবেষণা চালিয়ে যান। কুর্তনে বলেছেন, প্রণব মাত্রেরই (ন্যূনতম শব্দজোড়ের মধ্যে) অর্থবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। তবে তিনি

মনে করতেন, এই ক্ষমতাটা ঠিক প্রণবের নয়, যে সব উপকরণ দিয়ে প্রণব গঠিত হয় সেগুলোর কারণেই এই ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। কোনো প্রণবকে যে ক্ষুদ্রতর উপাদানে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, মূলত সেই বিশেষ ধারণাটির উপর ভিত্তি করেই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রণবের স্বলক্ষণ তথা স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেন কুর্তনের ছাত্র রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে (লেলিনগ্রাদ) গবেষণারত L.V. Scerba (১৮৮০-১৯৪৪)। প্রণবের অর্থবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষমতাই ছিল মূলত সের্বার আগ্রহের বিষয়বস্তু। একাধিক ধ্বনিপরিবর্তনের সমষ্টি মাত্রেই প্রণব– কুর্তনে বা কুজজেভস্কির এই সংজ্ঞার সাথে একমত হওয়া সম্ভব ছিল না সের্বার পক্ষে, কারণ সেক্ষেত্রে, ধরুন, বাংলার ক্ষেত্রে 'ঘ' এবং 'গ'-কে একই প্রণব বলতে হয়, কারণ অক্ষরের উপধায় ('বাঘ' শব্দে) 'ঘ' পরিণত হয় 'গ'-তে। কিন্তু সে দাবি ধোপে টিকবে না, কারণ অক্ষরের উপধায় ছাড়া অন্যত্র 'ঘ' এবং 'গ' অর্থবৈষম্য সৃষ্টি করতে সক্ষম ('গা/ঘা')। সুতরাং সের্বার দৃষ্টিতে 'ঘ' এবং 'গ' এক প্রণবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে ইংরেজির দুই 'প' (একটি মহাপ্রাণ, অন্যটি অল্পপ্রাণ) এবং বাংলার দুই 'আ' (একটি হ্রস্ব, অন্যটি দীর্ঘ) একই প্রণব, কারণ এদের অর্থবৈষম্য সৃষ্টির ক্ষমতাই নেই। 'কোনো অবস্থাতেই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষতা হারায় না এমন সব রূপবৈষম্যযুক্ত ধ্বনিরূপগুলো একই প্রণবের অন্তর্ভুক্ত'– সের্বার এই সংজ্ঞাটিই মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে গড়ে ওঠা লেলিনগ্রাদ স্কুলের প্রণবের সংজ্ঞা।

৪. মস্কো স্কুল ও প্রাগস্কুল

সোস্যুর এবং কুর্তনে – আধুনিক ভাষাতত্ত্বের এই দুই আদিগুরুর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে ১৯১৫ সালে মস্কো ভাষাতাত্ত্বিক চক্র গঠিত হয়। এই চক্রের দুই বিখ্যাত সদস্য ছিলেন Roman Jacobson (১৮৯৬-১৯৮২) এবং প্রিন্স Nicolaj Sergeevic Trubetzkoy (১৮৯০-১৯৩৮)। য়্যাকবসন সের্বার রচনা পড়ে কুর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা এবং প্রণবের স্বাতন্ত্র্যসূচক স্বলক্ষণের ধারণার সাথে পরিচিত হন। মস্কো চক্রের আর এক সদস্য Sergej Karcevskij (জন্ম: ১৮৮৪) ১৯০৭ সালে জেনেভায় অভিবাসী হয়েছিলেন। সেখানে তিনি অধ্যাপক অধ্যাপক সোস্যুরের কাছে ভাষাবিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেন। জেনেভায় ওঁর সহপাঠী ছিলেন Bally এবং Sechehaye, যাঁরা গুরু সোস্যুরের মৃত্যুর পর তাঁর দেয়া ক্লাসনোটের উপর ভিত্তি করে ১৯১৫ সালে Cour de linguistique générale মুদ্রণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কার্সেভস্কি ১৯১৭ সালে মস্কো ফিরে এসে মস্কো চক্রের অন্য সদস্যদের কাছে সোস্যুরের জেনেভা স্কুলের চিন্তাধারা তুলে ধরেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর মস্কোচক্রের অনেক সদস্য দেশত্যাগ করে হাজির হন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগে। সেখানে য়্যাকবসন, কার্সেভস্কি প্রমূখকে নিয়ে ১৯২৫ সালে গঠিত হয় প্রাগ স্কুল। ক্রুবেতস্কয়ও কাছাকাছিই থাকতেন, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়।

ক্রুবেতস্কয় (১৯৩৯) মনে করতেন, ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব ভিন্ন দুটি শাস্ত্র। ধ্বনিবিজ্ঞান বা ফোনেটিক্স প্রতিটি ধ্বনির ফিজিওলজিক্যাল (উচ্চারণকালীন অঙ্গসংস্থান) অ্যাকুস্টিক এবং শ্রবণগত বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার করবে। ধ্বনিতত্ত্ব দেখবে, কোনো বিশেষ ভাষায় কোনো বিশেষ ধ্বনি আদৌ কোনো ভূমিকা বা ফাংশন পালন করছে কিনা। যদি করে থাকে, তবে সেই ভূমিকা বা ফাংশানাল দিকটি বিচার করে দেখবে ধ্বনিতত্ত্ব বা ফনোলজি। ক্রুবেতস্কয়ের মতে, ধ্বনিবিজ্ঞানের জন্যে প্রাসঙ্গিক হতে পারে এমন অনেক তথ্য ধ্বনিতত্ত্বের জন্যে অবান্তর বিবেচিত হতে পারে। যে স্বলক্ষণগুলো স্বাতন্ত্রসূচক নয়, যেমন ইংরেজি 'প' এর মহাপ্রাণতা বা বাংলা 'আ' এর দৈর্ঘ্য সেগুলো ধ্বনিবিজ্ঞানের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ধ্বনিতত্ত্বের জন্যে এগুলোর তেমন কোনো মূল্য নেই। সুতরাং এই দুই শাস্ত্রের ক্ষেত্র (Domain) আলাদা; অভিজ্ঞান (Representation/Entity) আলাদা। কাকে আমরা বলছি অভিজ্ঞান? ধরা যাক, আপনি লক্ষ্য করলেন: A becomes B in the context of C। এখানে A আর

B হচ্ছে অভিজ্ঞান (ক্রিয়া 'অভিজ্ঞাপন', বিশেষ্য 'অভিজ্ঞান')। ধ্বনিবিজ্ঞানী ও ধ্বনিতাত্ত্বিক– এই দুই জনের কাজের পদ্ধতিও আলাদা। ধ্বনিতত্ত্ব আর ধ্বনিবিজ্ঞানের পার্থক্য নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের উজানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলো মূলত ক্রুবেতস্কয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়েছে।

প্রাগস্কুল ধ্বনিতত্ত্ব প্রধানত ধ্বনিতত্ত্বে ব্যবহৃত অভিজ্ঞানের উপর জোর দেয়। এই অভিজ্ঞান হচ্ছে 'প্রণব'। যে স্বলক্ষণ/বিশেষত্ব/বৈশিষ্ট্যগুলো ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে প্রাসঙ্গিক শুধু সেই স্বলক্ষণগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ধ্বনিচিত্রই হচ্ছে প্রণব। মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র স্বাতন্ত্র্যসূচক স্বলক্ষণের ভিত্তিতে প্রণব নির্ধারণ প্রাগস্কুলের ধ্বনিতত্ত্বের মূল কথা নয়। ব্যাপারটা এমন নয় যে প্রণবগুলো এক একটি ইটের মতো বস্তু এবং সেগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি জোড়া দিয়ে দেয়ালের মতো ভাষা সৃষ্টি হয়ে গেলো। না, ব্যাপারটা অত সরল নয়। মূল কথা হচ্ছে, প্রতিটি প্রণব ভাষা নামক সিস্টেম বা সংশ্রয়ে বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রণবগুলো একই সাথে একটি সংশ্রয়ের অংশ এবং একে অপরের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যসূচক সম্পর্কে সম্পর্কিত। ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রথমে কোনো ভাষার প্রণবগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবেন। তারপর সেই প্রণবগুলোর পরস্পরের মধ্যে স্বলক্ষণ-বৈষম্যগুলো নির্ধারণ করবেন। এই স্বলক্ষণ-বৈষম্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকাই হচ্ছে সেই ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক সংশ্রয়। দুই ধরণের স্বলক্ষণ-বৈষম্য আছে: ১. বিচ্ছিন্ন (Isolated) ও ২. পৌনঃপুনিক (Proportional/Recurrent)। বাংলায় 'দ' আর 'ম' এর মধ্যে যে স্বলক্ষণ-বৈষম্য রয়েছে ([+ ঘোষ, + দন্ত্য] বনাম [+ ওষ্ঠ্য, + নাসিক্য]) সেটা বিচ্ছিন্ন (আমরা যেমন বলি 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা') কারণ দ্বিতীয় আর কোনো প্রণবজোড়ে এই স্বলক্ষণ-বৈষম্য নেই। অন্যদিকে 'প' আর 'ব'-এ লক্ষ্যনীয় স্বলক্ষণ-বৈষম্য ([–ঘোষ] বনাম [+ ঘোষ]) আরও বেশ কিছু প্রণব-জোড়ে পাওয়া যায়: 'ত'/'দ', 'চ'/'জ' ইত্যাদি।

ধ্বনিতত্ত্বে কমপক্ষে তিনটি নতুন ধারণা যোগ করেন ক্রুবেতস্কয়: ১. 'নিরপেক্ষতা' (Neutralization), ২.'মহাপ্রণব' (Archiphoneme) এবং 'রূপপ্রণব' (Morphomeme)। নিরপেক্ষতা আর মহাপ্রণব পরস্পর সম্পর্কিত। বাংলায় 'ঘ' আর 'গ' আলাদা প্রণব, 'ঘ' মহাপ্রাণ, 'গ' অল্পপ্রাণ। কিন্তু 'বাঘ' শব্দের শেষে 'ঘ' আর 'গ' এর মধ্যে মহাপ্রাণতার পার্থক্য 'নিরপেক্ষ' (Neutralized) হয়ে যায়। ক্রুবেতস্কয়ের মতে, এ ধরণের পরিস্থিতিতে একই প্রণব /G/ এক প্রতিবেশে 'ঘ' থাকে আর অন্য একটি প্রতিবেশে 'গ'-এ পরিণত হয়। এই /G/ হচ্ছে এক মহাপ্রণব যার মধ্যে 'ঘ' এবং 'গ'– এই উভয় প্রণবের স্বলক্ষণই আছে। রূপপ্রণব কী সেটা দেখা যাক। বাংলা 'সন্ত্রস্ত' শব্দে তালব্য 'শ' দন্ত্য 'স'-তে পরিণত হয়, অথচ 'সন্ত্রাস' শব্দে তালব্য 'শ'-ই থাকে। ক্রুবেতস্কয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষেত্রে অন্তর্লীনভাবে একটা রূপপ্রণব ক্রিয়াশীল আছে। একই রূপপ্রণব কোনো প্রতিবেশে 'স' হচ্ছে আর অন্য কোনো প্রতিবেশে 'শ' থাকছে। 'স' এবং 'শ' মিলে একটা রূপপ্রণব। ক্রুবেতস্কয় (১৯৩৪:৩০) লিখেছেন: "Every alternation corresponds in the linguistic consciousness to a *morphoneme*, i.e. the totality considered as a morphological unit of the phonemes participating in the alternation in question" অনুবাদ: '(রূপতাত্ত্বিক প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত) কোনো প্রণবের যত রকম পরিবর্তন হয় সেই সবগুলো পরিবর্তন বাচকের/বক্তার বৈয়াকরণিক বোধে একটি রূপপ্রণবের অন্তর্ভূক্ত হবে। এর মানে হচ্ছে, যদি কোনো প্রণব (প্রতিবেশ অনুসারে) পরিবর্তিত হয়, তার সবগুলো পরিবর্তনের সমষ্টিকে একটি রূপতাত্ত্বিক একক হিসেবে বিবেচনা করা হবে।'

ক্রুবেতস্কয় ব্যাকরণে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করেন: রূপধ্বনিতত্ত্ব (Morphophonology)। ক্রুবেতস্কয়ের মতে, রূপধ্বনিতত্ত্ব তিনটি বিষয় বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে: ১. রূপমূলের ধ্বনিতাত্ত্বিক কাঠামো ২. একাধিক রূপমূল পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার কারণে সেই রূপমূলগুলোতে উদ্ভূত ধ্বনিগত পরিবর্তন, এবং ৩. রূপতাত্ত্বিক ভূমিকা পালন করে এমন সব ধ্বনিগত পরিবর্তন। ক্রুবেতস্কয়ের মৃত্যুর পর ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত Grundzüge গ্রন্থে অবশ্য এই তিনটি বিষয়ে কোনোই আলোকপাত করা

হয়নি। এই পুস্তকের (অদ্যাবধি অপ্রকাশিত) দ্বিতীয় খণ্ডে রূপধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকার কথা ছিল। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত রুশ রূপধ্বনিতত্ত্বের বর্ণনামূলক প্রবন্ধে অবশ্য ক্রুবেতস্কয়ের উপরোক্ত চিন্তাধারার প্রতিফলন আছে।

প্রাগস্কুলের অন্যতম পুরোধা য়্যাকবসন মনে করতেন, প্রণব নয়, স্বলক্ষণগুলোই আসলে ধ্বনিতত্ত্বের একক হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তিনি আরও দাবি করতেন যে বৈপরিত্য-সূচক স্বলক্ষণের একটি বিশ্বজনীন তালিকা আছে এবং দুটি ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যে তফাৎ হবার অন্যতম কারণ হচ্ছে দুটি ভাষায় কখনই একই স্বলক্ষণ-সঙ্কলন (Collection of features) ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজিতে যে স্বলক্ষণ-সঙ্কলন ব্যবহৃত হয়, ইংরেজিরই ভগ্নীভাষা জার্মানে তার থেকে ভিন্ন একটি সঙ্কলন ব্যবহৃত হয়। ১৯৩৮ সালে ক্রুবেতস্কয়ের অকালমৃত্যুর পর য়্যাকবসনের স্বলক্ষণ-বিষয়ক ভাবনাগুলো বিকশিত হতে শুরু করে। এই সব ভাবনার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব, তবে সেটা আরও অনেক পরে, তিন দশক ধরে মার্কিন কাঠামোবাদী ভাবনা বিকশিত হবার পর।

৪. ইঙ্গ-মার্কিন কাঠামোবাদী স্কুল

Edward Sapir (1984-1939) এর মতে, প্রণব একটি বিমূর্ত, মনস্তাত্ত্বিক স্বত্ত্বা। প্রণব স্বরযন্ত্র দিয়ে উচ্চারণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু উচ্চারণযোগ্য হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। উচ্চারণ না করে (ইশারা ভাষায় যেমনটা হয়ে থাকে) একটি হস্তমুদ্রা দিয়ে বা (লিখিত ভাষায়) বর্ণ দিয়ে কোনো বিশেষ প্রণবকে প্রকাশ করা যেতে পারে। সাপির তাঁর প্রণবের ধারণা বোঝাতে গিয়ে মুগরের উদাহরণ দিয়েছেন। মুগরের একটি বিশেষ আকার আছে, সাধারণত কাঠ দিয়ে তৈরি হয় মুগর। কিন্তু মুগর কী দিয়ে তৈরি হলো, মুগরের আকার আদৌ মুগরের মতো হলো কিনা... এসব বিষয় জানা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এসবের চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, যে জিনিষটাকে 'মুগর' বলা হচ্ছে সেটা আদৌ মুগরের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা। আবার এটাও ঠিক, যে কোনো একটা বস্তুকে মুগর বলার উপায় নেই, ঠিক যেভাবে যে কোনো চিৎকারকে আমরা 'ব' বা 'ঘ' প্রণব বলতে পারি না। প্রতিটি প্রণব হচ্ছে একটি বিশেষ বস্তু যেটিকে বক্তা বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। প্রতিটি প্রণব একটি ক্ষুদ্র, সসীম প্রণব-তালিকার অংশ। প্রতিটি প্রণব অন্য প্রণবের সঙ্গে তুলনীয়, সবগুলো প্রণব মিলে গড়ে উঠে একটি সংশ্রয় বা সিস্টেম– এগুলোই প্রণবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সস্যুর বা কুর্তনের আমল থেকে চলে আসা প্রণবের বিভিন্ন সংজ্ঞা: 'আদর্শ ধ্বনি' (Ideal Sound), 'উচ্চারিত ধ্বনির মানসিক প্রতিরূপ' (the mental equivalent of speech sound) ইত্যাদির ছায়া লক্ষ্য করা যেতে পারে সাপিরের প্রণব-ভাবনায়।

ব্রিটিশ ঐতিহ্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক Daniel Jones (১৮৮১-১৯৬৭) বা মার্কিন কাঠামোবাদী বৈয়াকরণ Leonard Bloomfield (১৮৮৭-১৯৪৯) মনে করতেন, প্রণব কোনো বিমূর্ত, মনস্তাত্ত্বিক সত্ত্বা নয়, শরীরের বাচন-অঙ্গ দিয়ে উচ্চারিত, মূর্ত একটি সত্ত্বা। জোনসের দৃষ্টিতে 'প্রণব হচ্ছে একটি ধ্বনিপরিবার' ("A family of sounds")। এই ধ্বনিগুলো স্বলক্ষণগতভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত এবং ধ্বনিগুলোর একটি যে প্রতিবেশে (ধরা যাক, কোনো শব্দে) ব্যবহৃত হয় অন্যটি কখনই সেই একই প্রতিবেশে (অন্য কোনো শব্দে) ব্যবহৃত হয় না। ব্লুমফিল্ডের (১৯৩৩:৭৯) মতে প্রণব হচ্ছে: 'স্বাতন্ত্র্য-সূচক স্বলক্ষণের ন্যূনতম একক' ("A minimal unit of distinctive sound feature")। তিনি মনে করতেন, প্রতিটি প্রণব হচ্ছে এমন কিছু ফোনেটিক বৈশিষ্ট্যের আধার যেগুলো বাচনকালে প্রকটিত হয়। এমন হতে পারে যে একাধিক ধ্বনির (ধরা যাক, 'প-১', 'প-২', 'প-৩') ফোনেটিক গুণ, ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলোর স্থির, অপরিবর্তনীয় কোনো ভগ্নাংশ (some constant fraction) বৈয়াকরণিক

ভূমিকার দিক থেকে সমতূল্য (Functionally equivalent) হলে সেই ভগ্নাংশটিকে আমরা প্রণব বলি। অথবা এমনও হতে পারে যে বাস্তবে উচ্চারিত ধ্বনিশ্রেণীর বৈয়াকরণিক ভূমিকা এক হলে সেই ধ্বনিশ্রেণীটি প্রণব হিসেবে গৃহীত হয়।

William Freeman Twaddell (1906-1982) এর মতে, প্রণবের উপরোক্ত দুই সংজ্ঞার কোনোটিই সঠিক নয়। প্রথমত, 'প্রণব একটি মনস্তাত্ত্বিক স্বত্ত্বা' – এটি কোনো মতেই বিজ্ঞানসম্মত কোনো সংজ্ঞা হতে পারে না। বিবিধ উদ্দীপনার প্রতি মানুষের সাড়া দেখে বাইরে থেকে মনের কাযক্রম কিছুটা আন্দাজ গেলেও 'মন' কি আমরা তা কিছুই প্রায় জানি না। সুতরাং একাধিক ধ্বনির ফোনেটিক গুণ, ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যবিচার এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর স্থির, অপরিবর্তনীয় কোনো ভগ্নাংশ নির্ধারণ করা... এই সব টডেলের মতে, কোনো ফোনেটিশিয়ানের গবেষণাপ্রকল্পের অংশ হতে পারে, কিন্তু ধ্বনিতত্ত্বের কোনো মডেল নির্মাণে এই সব তথ্য কোনো কাজে আসবে না। টডেল মনে করেন, প্রণব নিছকই একটি 'কাল্পনিক' একক, কোনো ভাষার উচ্চারিত অংশের বর্ণনা দেবার প্রয়োজনে এই এককটি ব্যবহৃত হয়। সোস্যুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রণব নির্ধারণে টডেল এক প্রণবের সাথে অন্য প্রণবের পার্থক্যের উপর জোর দেন। এন্ডারসন মনে করেন (১৯৮৫:২৯৩): 'কোনো ভাষার প্রণবগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যমূলক সম্পর্ক (Differential relation) ধ্বনিতত্ত্বের ভিত্তি শুধু নয়, এই সম্পর্ক আবিষ্কার ধ্বনিতত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্যও বটে! – যে অল্প কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিক এই দাবি করেছিলেন তাদের মধ্যে সোস্যুর আর টডেল অন্যতম।'

প্রণবের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ধ্বনিতত্ত্বের মূল একক যে প্রণব তা নিয়ে মার্কিন কাঠামোবাদী ব্যাকরণধারায় কোনো দ্বিমত ছিল না। প্রতিবেশভেদে প্রণবের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা চলছে সেই কাযান স্কুলের আমল থেকে। এই পরিবর্তন যে দুই প্রকার: স্বয়ংক্রিয় এবং প্রতিবেশ-নির্ভর সেটাও জানা ছিল বেশির ভাগ ধ্বনিতাত্ত্বিকের। বলা বাহুল্য, স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তনগুলো যে ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত তা নিয়েও কারও দ্বিমত ছিল না আধুনিক ধ্বনিতত্ত্বের সূচনা থেকেই। যে পরিবর্তনগুলো প্রতিবেশ-নির্ভর অর্থাৎ যেগুলো বিশেষ রূপতাত্ত্বিক প্রতিবেশে কার্যকর হয় (উদাহরণ: সন্ত্রাশ/সন্ত্রস্ত শব্দজোড়ে শ>স) সেগুলো নিয়েই বিতর্ক ছিল, বিতর্ক আছে এবং হয়তো আরও অনেক দিন চলবে এই বিতর্ক।

উপরোক্ত পরিবর্তনগুলোকে 'রূপধ্বনিতত্ত্ব' নামক নতুন এক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ক্রুবেতস্কয়। রূপধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মগুলো ক্রুবেতস্কয়ের সময় থেকেই কোনো না কোনো রূপমূল বা মরফিমের সাথে সম্পর্কিত। Moris Sawdesh (1909-1967) এর মতে, 'রূপধ্বনিতত্ত্ব' হচ্ছে রূপমূলের প্রাণবিক কাঠামো বিচার করা এবং দুই প্রণবের মধ্যে অদলবদল কীভাবে রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করা। রূপমূল কী? ব্লুমফিল্ডের অনুসরণে Zellig Harris (1909-1992) ১৯৪২ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রূপমূলের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন: 'এমন একটি অর্থপূর্ণ প্রণবক্রম যাকে ক্ষুদ্রতর কোনো অর্থপূর্ণ অংশে বিভক্ত করা যায় না।' সংজ্ঞাটি সাপিরকে পরিবর্তন করতে হয়েছিল অনতিবিলম্বে, কোনো কোনো মরফিমের পরিবর্তনশীল আচরণের কারণে, যেমন ধরুন বাংলায়: {সন্ত্রাশ}, {সন্ত্রস}+{তো} বা {knife}, {knive}+{s}। মরফিমের পরিবর্তনশীলতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হারিস প্রস্তাব করলেন, প্রতিটি মরফিম আসলে কিছু অ্যালোমর্ফের (Allomorph) সমষ্টি, ঠিক যেমন প্রতিটি ফোনিম একাধিক অ্যালোফোনের সমষ্টি। {সন্ত্রাশ} এবং {সন্ত্রস} আলাদা দুটি অ্যালোমর্ফ। ইংরেজি books, beds ও roses শব্দের শেষে ব্যবহৃত যথাক্রমে {s}, {z} ও {iz} – এই তিনটি অ্যালোমর্ফ একটিই মরফিমের তিনটি পৃথক অ্যালোমর্ফ। একইভাবে {knife} এবং {knive} ইংরেজি শব্দকোষে অন্তর্ভুক্ত আছে একই মরফিমের অ্যালোমর্ফ হিসেবে। কোনো ভাষার রূপতাত্ত্বিক বর্ণনার সময় বলা হবে যে বিশেষ ক্ষেত্রে {knive} ব্যবহৃত হবে এবং অন্যত্র ব্যবহৃত হবে {knife}। প্রবন্ধের শেষের দিকে

হারিস রূপধ্বনিতত্ত্বের ব্যপারটা আরও সহজ করে বর্ণনা করলেন এই বলে যে knife এর অন্তে যে /f/ আছে সেটি একটি মরফোফোনেমিক প্রতীক: F যেটি knives শব্দে /v/-তে পরিণত হয়। লক্ষ্যনীয় যে fife শব্দের শেষে এই প্রতীকটি নেই, যে কারণে fife এর বহুবচন *fives নয়। এটা অবশ্য নতুন কোনো প্রস্তাব নয়। আরও তিন/চার বছর আগে, ক্রুবেতস্কয় (১৯৩৮) এবং Sawdesh & Voegelin (1939) এই F-কে 'রূপপ্রণব' (Morphoneme/Morphophoneme) বলেছিলেন।

৫. সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব

উপরের আলোচনার সিংহভাগ ইওরোপীয় ও মার্কিন কাঠামোবাদী ধ্বনিতত্ত্বের বর্ণনা। কেন এর নাম 'কাঠামোবাদী' ধ্বনিতত্ত্ব? সোস্যুর বলেছিলেন, ভাষা হচ্ছে এমন একটি কাঠামো, সিস্টেম বা সংশ্রয় যা তার সব উপাদানকে ধারণ করে (où tout se tient)। প্রতিটি উপাদানের একটির সাথে আর একটি বৈপরীত্য-সূচক সম্পর্কে সম্পর্কিত। দাবা খেলার মতোই, ইচ্ছে করলেই কোনো একটি গুটি বাদ দেয়া যায় না, চালের কোনো একটি নিয়ম বদলানো যায় না। ভাষার গুটিগুলো হচ্ছে: প্রণব, রূপমূল, শব্দ, বাক্য...। এগুলোকে বলা হয় Representation, বর্তমান প্রবন্ধের উজানে যার বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছি আমরা: 'অভিজ্ঞান'। এন্ডারসন (১৯৮৫:৩০৯) বলেছেন, মার্কিন কাঠামোবাদীরা মনে করতেন, ভাষা হচ্ছে উপরোক্ত অভিজ্ঞানগুলোর কয়েকটি ক্ষমতানুক্রমিক তালিকা (a hierarchy of inventories)। প্রথমে আছে একটি ফোনিম বা প্রণব-তালিকা। প্রণবগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি হয় অ্যালোমর্ফ/মরফিম যেগুলো আবার ব্যবহৃত হয় শব্দ ও অন্যান্য সিন্টাক্টিক উপাদানের কাঁচামাল হিসেবে। সেই সিন্টাক্টিক উপাদানগুলোরও আবার আলাদা আলাদা তালিকা রয়েছে।

আমরা স্মরণ করতে পারি যে মরিস হালের গুরু রোমান ইয়াকবসন মনে করতেন, 'প' বলতে আসলে কিছু নেই, বিশেষ কিছু স্বলক্ষণ একত্রিত হলেই 'প' সৃষ্টি হয় বা 'প' এর বোধ জন্মে। যেমন 'প' এর স্বলক্ষণ হচ্ছে: [+ ওষ্ঠ (Labial), + রুদ্ধ (+ Occlusive)]; 'ক' এর স্বলক্ষণ হচ্ছে [+ কণ্ঠমূল, + রুদ্ধ] ইত্যাদি। এর অর্থ হচ্ছে: 'প' প্রণবটি উচ্চারণ করতে ওষ্ঠদ্বয়ের বিশেষ ভূমিকা আছে এবং/বা প্রণবটি উচ্চারণ করতে গিয়ে ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ হয়ে মুখগহ্বর রুদ্ধ হয়; 'ক' প্রণব উচ্চারণে প্রধান ভূমিকা কণ্ঠমূলের এবং প্রণবটি উচ্চারণ করতে গেলে কণ্ঠমূলে মুখগহ্বর রুদ্ধ হয়। এভাবে প্রতিটি প্রণবকেই একাধিক স্বলক্ষণে বিশ্লেষণ করা যায়, অথবা একাধিক স্বলক্ষণ একত্রিত করলে পাওয়া যায় এক একটি প্রণব। ইয়াকবসন দাবি করেছিলেন, বৈপরিত্য-সূচক স্বলক্ষণের একটি বিশ্বজনীন তালিকা আছে এবং প্রতিটি ভাষায় সেই স্বলক্ষণগুলোর আলাদা আলাদা সঙ্কলন ব্যবহৃত হয়।

আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ইওরোপীয় ও মার্কিন কাঠামোবাদে সিংহভাগ মনোযোগ দেয়া হয়েছে অভিজ্ঞানের উপর। কোন 'প্রক্রিয়ায়' অভিজ্ঞানগুলো পরস্পরের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তার প্রতি তেমন কোনো মনোযোগ দেওয়া হয়নি। ইয়াকবসনের ছাত্র মরিস হালে (জন্ম: ১৯২৩) তাঁর ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত Sound Pattern of Russian পুস্তকে দাবি করলেন: ভাষা কোনো অভিজ্ঞানের তালিকা নয়, ভাষা হচ্ছে প্রক্রিয়া অর্থাৎ 'নিয়ম বা সূত্রের একটি সংশ্রয়' (A system of rules)। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত Syntactic Structure পুস্তকে চমস্কিও একই দাবি করেছিলেন বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে: ভাষার নিয়মগুলো বিশ্বজনীন, যদিও সব নিয়ম সব ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। চমস্কি ও হালের যৌথ গবেষণার ফলশ্রুতি Sound Pattern of English প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। এই পুস্তকে ফনোলজির যে মডেল উপস্থাপন করেন লেখকদ্বয় সেটি **সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব** (Generative Phonology) নামে পরিচিতি লাভ করে।

সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে প্রণবের পরিবর্তে অভিজ্ঞান হিসেবে ব্যবহৃত হয় স্বলক্ষণ। চমস্কি ও হালে যে শুধু ধ্বনিতত্ত্বের অভিজ্ঞান পরিবর্তন করলেন তাই নয়, ধ্বনিতত্ত্বের প্রক্রিয়াকেও আমূল বদলে দিলেন তাঁরা। ধ্বনিতত্ত্বের বেশির ভাগ মডেলে প্রতিটি ভাষিক বস্তু, যেমন শব্দ, বর্গ (Phrase) বা বাক্যের দু'টি স্তর আছে বলে দাবি করা হয়: ১. **অন্তর্লীন স্তর** (Underlying structure) আর ২. **ভূমিস্তর** (Surface structure)। এই দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা ধ্বনিতত্ত্বের অন্যতম প্রধান কাজ। অন্তর্লীন স্তরে যা 'বাঘ', ভূমিস্তরে এসে তা হয়ে যায় 'বাগ'। অন্তর্লীণ স্তরে যা 'সন্ত্রাশতো', ভূমিস্তরে এসে তা হয়ে যায় 'সন্ত্রস্ত'। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের আলোকে অন্তর্লীণ স্তরের 'বাঘ' ভূমিস্তরে এসে 'বাগ' উচ্চারিত হওয়াটা নিম্নরূপভাবে সূত্রায়িত করা যেতে পারে।

সূত্র-১: [+ মহাপ্রাণ] → [– মহাপ্রাণ] / —— ++
উদাহরণ: বাঘ → বাগ; লাভ → লাব; পথ → পত

এই সূত্রের অর্থ হচ্ছে, শব্দের প্রান্তভাগে (যার চিহ্ন: ++) [– মহাপ্রাণ] স্বলক্ষণ [+মহাপ্রাণ] স্বলক্ষণকে প্রতিস্থাপিত করে (সঞ্জননী ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনায় স্বলক্ষণগুলোকে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দেখানো প্রচলিত রীতি)। এ ধরণের সূত্রের মূল কথা হচ্ছে: C-নামক **প্রতিবেশে** (Context) বস্তু A রূপান্তরিত হয় বস্তু B-তে (ইংরেজিতে বললে: A becomes B in the context of C)। উপরের সূত্রে 'বাঘ' এর 'ঘ' হচ্ছে A, 'গ' হচ্ছে B এবং প্রতিবেশ / —— ++ হচ্ছে C।

সন্ত্রাস/সন্ত্রস্ত শব্দজোড়ে /শ/>/স/-পরিবর্তনটি ২নং সূত্র দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, রূপমূলের সীমানায়, [+ দন্তমূলীয়] স্বলক্ষণের উপস্থিতিতে [+ শীষ, + তালব্য] স্বলক্ষণ [+ শীষ, + দন্তমূলীয়] স্বলক্ষণে পরিণত হয়।

সূত্র-২: [+ শীষ, + তালব্য] → [+ শীষ, + দন্তমূলীয়] / —— [+দন্তমূলীয়]
উদাহরণ: বিন্যাশ → বিন্যস্ত; শন্ত্রাশ→ শন্ত্রস্ত

১নং সূত্রের সাথে সঙ্গে ২নং সূত্রের পার্থক্য রয়েছে। ১নং সূত্রের কোনো ব্যতিক্রম নেই। অতি সচেতন হলে কেউ কেউ 'লাভ', 'পথ', 'লাখ' ইত্যাদি শব্দের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় রাখতে পারলেও সব সময় তা পারবে না বা সব বাংলাভাষীর পক্ষেও ব্যতিক্রমহীনভাবে তা করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় সূত্রটির ব্যতিক্রম রয়েছে– 'ত' এর অগ্রবর্তি শীষ তালব্য প্রণব সব ক্ষেত্রে 'স'-তে পরিণত হয় না। 'হাশা' আর 'হাশতো' বা 'মাশি' আর (বাংলাদেশে) 'মাশতুতো' শব্দের উচ্চারণের তুলনা করলে আমরা দেখবো যে ধাতু √হাশ কিংবা প্রাতিপাদিক 'মাশি'র অন্তে অবস্থিত তালব্য শীষ প্রণবের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, যদিও এসব শব্দে তালব্য 'শ' প্রণব {তুতো} বা {তো} প্রত্যয়ের 'ত' প্রণবের অগ্রবর্তি হচ্ছে। সুতরাং ২নং নিয়মটি কেবলমাত্র 'সন্ত্রস্ত' এর মতো বিশেষ কিছু শব্দ গঠনের সময় ক্রিয়াশীল হয় এবং সে কারণে নিয়মটি 'সর্বব্যাপী' (Automatic) নয়, একান্তভাবে বিশেষ 'প্রতিবেশ নির্ভর' (Context-sensitive)।

২নং নিয়মের মতো নিয়মকে বলা হয়ে থাকে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম। ক্রুবেতস্কয় মরফোফোনলজি বা রূপধ্বনিতত্ত্বকে ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করেননি। মার্কিন কাঠামোবাদীদের মধ্যে অনেকে, যেমন সাপির আর (প্রথম দিকে) ব্লুমফিল্ড রূপধ্বনিতত্ত্বের অনেক নিয়মকে ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম হিসেবেই দেখতেন। তবে সোয়াদেশ এবং ত্রিশের দশকের শেষের দিকে ব্লুমফিল্ড নিজেও ক্রুবেতস্কয়ের অনুসরণে ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপধ্বনিতত্ত্বকে আলাদা শাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইওরোপে ধ্বনিতত্ত্ব যতই বিকশিত হচ্ছিল ততই রূপধ্বনিতাত্ত্বিক বা মরফোফোনোলজিক্যাল নিয়মগুলো বাদ পড়ে যাচ্ছিল ফনোলজি থেকে। এমন সময় স্রোতের বিপরীত দিকে গিয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত

নিলেন চমস্কি ও হালে (১৯৬৮)। মরফোফনোলজিকে ফনোলজির অন্তর্ভুক্ত করলেন তাঁরা। সঞ্জননী দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্বনিতত্ত্বের ১ ও ২নং সূত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দুটি সূত্রই বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ব্লুমফিল্ডের রূপধ্বনিতত্ত্বের ভিত্তি ছিল পাণিনির ব্যাকরণ: কোনো শব্দের একটি অন্তর্লীন রূপ (Base form) থাকবে এবং কয়েকটি ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র কার্যকর হয়ে সেই রূপটি ভূমিস্তরে পৌঁছাবে। ব্লুমফিল্ডের মতে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মগুলো পর্যায়ক্রমে কার্যকর হয়। ভাষার ব্যাকরণই বলে দেবে কোন নিয়মটির পর কোন নিয়মটি কার্যকর হবে। উদাহরণস্বরূপ, knife শব্দের সাথে বহুবচনদ্যোতক প্রত্যয় {s} যুক্ত হলে আমরা পাবো knifes। কিন্তু আমরা জানি, এর বহুবচন রূপ (উচ্চারণে) knivez। এর মানে হচ্ছে /ফ/ প্রথমে /ভ/-এ পরিণত হয়েছে এবং তারপর /ভ/ এর কারণে /স/ পরিণত হয়েছে /য/-এ। সুতরাং /ফ/>/ভ/ হচ্ছে প্রথম নিয়ম এবং /স/>/য/ হচ্ছে দ্বিতীয় নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়ম যখন কার্যকর হয় তখন knife এর শেষে যে /ফ/ ছিল তা জানার উপায় নেই, কারণ প্রথম নিয়মের কারণে /ফ/-এর অস্তিত্ব মুছে গেছে।

সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বেও ধ্বনিপরিবর্তন সূত্রগুলো পর্যায়ক্রমে কার্যকর হয়। নিচের উদাহরণগুলো (Chomsky & Halle (1968:219) লক্ষ্য করা যাক:

a) critical/criticism/criticize/ b) medicate/medecine/medical/ c) regal/regicide

উপরের শব্দগুলোতে আমরা দুটি ধ্বনিপরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারি: ১) কণ্ঠ্য প্রণব /ক/, /গ/ ইত্যাদি /স/ ও /জ/-তে পরিণত হচ্ছে এবং ২) স্বরপ্রণব /ই/ পরিবর্তিত হচ্ছে /আই/ ও /অ/-তে। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে Velar Softening Rule নামে একটি ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র আছে। এই সূত্র অনুসারে কোনো কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনপ্রণব যদি কোনো [+উচ্চ] স্বরপ্রণবের (/ই/, /ও/ ইত্যাদি) অগ্রবর্তী হয় তবে সেই কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনপ্রণবটি একই বর্গের তালব্য ব্যঞ্জনপ্রণব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। চমস্কি ও হালে দাবি করেন যে উপরের শব্দগুলোতে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের এই কণ্ঠ-কোমলীকরণ সূত্রটি কার্যকর হচ্ছে। তাঁরা আরও দাবি করেন যে এই সূত্র কার্যকর হচ্ছে স্বরপরিবর্তন সূত্র কার্যকর হওয়ার আগে, কারণ [+নিম্ন] স্বরপ্রণব /এ্যা/ বা [−উচ্চ] স্বরপ্রণব /অ/ এর অগ্রবর্তী হলে (critical/medicate) /ক/ এর পরিবর্তন হয় না। ভূমিস্তরে উচ্চারিত critisism ও medecine শব্দের অন্তর্লীন রূপ যথাক্রমে critikism ও medekin। প্রথমে [+উচ্চ] স্বরপ্রণব /ই/-এর প্রভাবে /ক/ /স/-তে পরিণত হয় এবং তারপর স্বরপ্রণব /ই/ নিজেই পরিবর্তিত হয় /আই/ ও /অ/-তে। অন্তর্লীণ স্তর থেকে regicide শব্দের ভূমিস্তরে আসা বর্ণনা করেছেন তাঁরা নিম্নরূপভাবে: reg+i+kid > rej+i+sid > rej+i+sid > rej+i+siyd >regisayd।

অন্তর্লীন স্তরের ধারণা পরোক্ষভাবে পাণিনির ব্যাকরণে আছে এবং আমরা এও দেখেছি, ব্লুমফিল্ড তাঁর ব্যাকরণে এই ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। কোনো বিশেষ প্রণবের প্রতিবেশভেদে একাধিক রূপ গ্রহণ করার ধারণাটা মূলত ক্রবেতস্কয়ের। ওঁর অনুসরণে সোয়াদেশ, ভোয়েজল্যাঁ ও হারিস এ ধরনের প্রণবকে মরফোফোনিম (ক্রবেতস্কয়ের ভাষায় 'মরফোনিম') বলেছেন। হারিসের ছাত্র চমস্কি মহাপ্রণব বা মরফোনিমের ধারণা পরিহার করেছেন বটে, কিন্তু 'বাঘ>বাগ' জাতীয় পরিবর্তনকে সূত্রায়িত করেছেন মার্কিন ও ইওরোপীয় কাঠামোবাদী ধ্বনিতত্ত্বের পরম্পরা অনুসরণ করে। প্রশ্ন হতে পারে, সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব কি তাহলে কাঠামোবাদী ধ্বনিতত্ত্বের বিকশিত রূপ?

আমরা বর্তমান আলোচনার উজানে দেখেছি, বিজ্ঞানের অন্য যে কোনো শাখার মতো ফনোলজিতেও বেশ কিছু মডেল বা তত্ত্ব রয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, একটি তত্ত্ব থেকে অন্য একটি তত্ত্বকে কিভাবে

আলাদা করা যাবে? কীভাবে প্রমাণ করা যাবে যে সঞ্জননী ধ্বনিবিজ্ঞান কাঠামোবাদী ধ্বনিবিজ্ঞানের বিকশিত রূপ নয়? রাজেন্দ্র সিংহ (১৯৯৬) এ প্রসঙ্গে তিনটি মানদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন: ১. **অভিজ্ঞান** (Representation) ২. **প্রক্রিয়া** (Mechanism) ও ৩. **ক্ষেত্র** (Domain)। বিজ্ঞানের যে কোন তত্ত্ব নির্দিষ্ট করে বলবে ১. কোন কোন অভিজ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত হবে, ২. কোন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞানগুলো পরস্পরের সাথে সংস্পর্শে আসবে (বা পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করবে) এবং ৩. অভিজ্ঞানগুলোর মধ্যে কোন কোন সম্পর্ক বা বিক্রিয়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত হবে। রাজেন্দ্র সিংহ (১৯৯৬) দাবি করেন যে ক্ষেত্রের প্রশ্নেই এক মডেল অন্য মডেলের চেয়ে আলাদা হয়, অভিজ্ঞান বা প্রক্রিয়ার প্রশ্নে নয়। অর্থাৎ, দুটি আলাদা মডেলের প্রবক্তারা প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞান ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু কখনই ক্ষেত্রের প্রশ্নে তাঁরা একমত হবেন না।

আমরা দেখেছি, ধ্বনিতত্ত্বের ইওরোপীয় ও মার্কিন কাঠামোবাদী মডেলে অভিজ্ঞান হচ্ছে: 'প', 'ত', 'ক' ইত্যাদি। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে অভিজ্ঞান হচ্ছে এই সব প্রণবের স্বলক্ষণ। প্রক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে সঞ্জননী মডেলের ধ্বনিপরিবর্তন সূত্রগুলোকে খুব একটা অভিনব মনে নাও হতে পারে, কারণ কুজজেভস্কিও একই প্রণবের একাধিক রূপ ধারণ করার কথা বলেছিলেন। স্বলক্ষণ-পরিবর্তন আর প্রণব-সংস্থাপন অনেকটা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তবে ক্ষেত্রের দিক থেকে দেখলে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বকে আলাদা মডেলের মর্যাদা দিতেই হবে, কারণ সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে মরফোফোনলজিকে আলাদা মডিউল বলে স্বীকার করা হয় না, যেখানে কাঠামোবাদী ধ্বনিতত্ত্বের প্রবাদপুরুষ ক্রুবেতস্কয় মরফোফনোলজিকে ফনোলজির তুলনায় আলাদা ও গুরুত্বপূর্ণ একটি মডিউল হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষপাতি ছিলেন।

৬. সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের কমপক্ষে তিনটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে: ১. অন্তর্লীন স্তরের অতিবিমূর্ততা, ২. ব্যাখ্যায় অপরাগতা, ৩. বর্ণনার ক্ষেত্রে কৃচ্ছতার শর্ত পূরণ না হওয়া।

'বাঘ' শব্দের যে একটি অন্তর্লীন স্তর আছে এবং সেই অন্তর্লীন স্তরে যে 'ঘ' আছে তার প্রমাণ কী? এর প্রমাণ, বাংলায় আমরা 'বাঘের' বলি, 'বাগের' বলি না। 'বাঘ' শব্দের অন্তর্লীন স্তরে অক্ষরের উপধায় যদি 'গ' থাকে তবে 'বাঘের' শব্দের ভূমিস্তরে এই 'গ' কীভাবে 'ঘ' হয়ে যায়? শব্দের যদি অন্তর্লীণ স্তর থাকে এবং সেই স্তরে 'বাঘ' শব্দটি যদি 'ঘ' দিয়ে শেষ হয়, তবে সূত্র-১ কার্যকর হয়ে 'বাঘ' ভূমিস্তরে এসে 'বাগ' উচ্চারিত হয়। 'বাঘের' শব্দে /ঘ/-এর উপর ১নং সূত্র কার্যকর হয় না, কারণ 'বাঘ' এখানে কোনো শব্দ নয়, 'বাঘ' একটি **রূপমূল** (Morpheme) (সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে রূপমূলের সীমাচিহ্ন: +; শব্দের সীমাচিহ্ন #)। ১নং সূত্র অনুসারে কোনো শব্দ মহাপ্রাণ প্রণব দিয়ে শেষ হতে পারবে না, কিন্তু কোনো রূপমূল মহাপ্রাণ প্রণব দিয়ে শেষ হতে বাধা নেই। 'বাঘের' শব্দটির অর্ন্তলীণ স্তর ও ভূমিস্তররের মধ্যে ধ্বনিগত কোনো পার্থক্য নেই।

কোনো শব্দ বা বাক্যের অন্তর্লীণ স্তরে কী আছে তা কীভাবে নির্ধারিত হবে? Jensen (2004:117) চারটি নিয়ামকের কথা উল্লেখ করেছেন:

১) আন্দাজযোগ্যতা (Predictablity): এর মানে হচ্ছে, অন্তর্লীণ স্তরের ফোনেটিক রূপ ভূমিস্তর সম্পর্কে কমবেশি ধারণা দেবে। অন্তর্লীণ স্তর ও ভূমিস্তরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক থাকতে পারবে না;

২) স্বাভাবিকতা/প্রাকৃতিকতা (Naturalness): অন্তর্লীণ স্তর থেকে ভূমিস্তরে উত্তরণের মধ্যে একটি স্বাভাবিকতা থাকবে। যেমন, অন্তর্লীণ স্তরের 'বাঘ' এর /ঘ/-এর মহাপ্রাণতা লোপ পেয়ে ভূমিস্তরে 'বাগ' হয়েছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা লোপ পাওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পক্ষান্তরে ভূমিস্তরে যদি 'বাগ' থাকতো তবে 'বাঘের' শব্দে /গ/-এর মহাপ্রাণতা অর্জন করাটা স্বাভাবিক নয়।

৩) সারল্য (Simplicity): অন্তর্লীণ স্তরের গঠন ও যে সূত্রের মাধ্যমে অন্তর্লীণ স্তর ভূমিস্তরে রূপান্তরিত হবে সেই সূত্ররচনার মধ্যে সর্বোচ্চ সারল্য থাকতে হবে।

৪) ধ্বনিতত্ত্বের প্রাধান্য (Preference of Phonological solutions): ধ্বনিতাত্ত্বিক সমাধানকে প্রাধান্য দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজিতে অন্তর্লীণ স্তর go+ed থেকে ভূমিস্তরে আমরা পাচ্ছি went। বাংলায় অন্তর্লীণ স্তর {আজ+এর} থেকে ভূমিস্তরে পাচ্ছি 'আজকের/আজগের'। এগুলো কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক সমাধান নয়।

অন্তর্লীণ স্তর ও ভূমিস্তরের মধ্যে ফোনেটিক মিল যত কমতে থাকে ততই বিমূর্ত হতে থাকে অন্তর্লীণ স্তর। সঞ্জননী মডেলের দুই স্থপতি মনে করেন, প্রয়োজনবোধে অন্তর্লীণ স্তর শতভাগ বিমূর্ত হতে পারে। কিন্তু কিপারস্কি (১৯৮২:১৫৯) এর মতে: "The alternation condition embodies a claim about the importance of phonetics in Phonology. It leads to underlying forms which are closely tailored to their phonetic realization", যার মানে হচ্ছে, অন্তর্লীণ স্তর খেয়ালখুশিমত বিমূর্ত হতে পারে না, অন্তর্লীণ স্তর ও ভূমিস্তরের মধ্যে ফোনেটিক অমিলের একটা সীমা থাকা উচিত। চমস্কি ও হালের কিছু কিছু শব্দের অন্তর্লীণ স্তর, যেমন, a) rixt>right, b) rīt>rite, c) mūntVn>mountain সম্পর্কে কিপারস্কি আপত্তি জানিয়েছেন (দ্রষ্টব্য: Sommerstein ১৯৭৭: ২১১)। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের প্রথম সমস্যা, অন্তর্লীন স্তরের মাত্রাতিরিক্ত বিমূর্ততা।

কোনো ঘটনার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ঘটনাটির নিছক বর্ণনা নয়, ঘটনার ব্যাখ্যার উপর জোর দেয়া হয়, জোর দেয়া হয় কৃচ্ছতার (Economy) উপর। ১ বা ২নং সূত্রে মূলত ঘটনার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, ঘটনার পেছনে কোনো কারণ দর্শানো হচ্ছে না। ১নং সূত্রের অর্থ হচ্ছে, 'বাঘ' এর 'ঘ' বিশেষ প্রতিবেশে 'গ'-এ পরিণত হচ্ছে। কিন্তু কেন এটা হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারাটা সঞ্জননী ব্যাকরণের একটা সমস্যা। উদারহরণস্বরূপ, ধ্বনিপরিবর্তনের নিম্নোক্ত তৃতীয় সূত্রটি বৈদিকে ছিল, সংস্কৃতে ছিল, কয়েকটি ইন্দো-আর্য ভাষায় আছে, অন্য অনেক ভাষায়ও আছে। অথচ খুব কম ভাষাতেই ২নং সূত্র দেখা যায়। কেন এমন হয়?

সূত্র-৩: [+ ব্যঞ্জন, − ঘোষ] → [+ ব্যঞ্জন, + ঘোষ] / ⎯⎯ [+দন্তমূলীয়]
উদাহরণ: গোলাপ+জল → গোলাবজল; ডাক+ঘর→ ডাগঘর

আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ই-এ-অ্যা-আ-উ-ও-অ স্বরপ্রণব বেশির ভাগ ভাষায় দেখা যায়, কিন্তু খুব কম ভাষাতেই ফরাসি বা তুর্কির মতো য়্যু-ওয়্-অ্য ইত্যাদি মধ্য স্বরপ্রণব আছে। এর কী ব্যাখ্যা আছে সঞ্জননী ব্যাকরণে? চমস্কি ও হালে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মার্কডনেসের (Markedness) কথা বলেন। যেসব স্বলক্ষণ বেশির ভাগ ভাষায় দেখা যায়, সেগুলো আনমার্কড (Unmarked) আর যেসব স্বলক্ষণ বিরল কিছু ভাষায় দেখা যায়, সেগুলো মার্কড (Marked)। স্বলক্ষণ বা ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মকে এভাবে দুই ভাগে ভাগ করাটা বিতরণমূলক, ব্যাখ্যামূলক নয়। কোনো স্বলক্ষণ কি মার্কড বলে বিরল হয়, নাকি বিরল হলেই কোনো স্বলক্ষণ মার্কড হয়? তাছাড়া, মার্কড স্বলক্ষণযুক্ত প্রণব দিয়ে

কীভাবে কিছু কিছু ভাষার (যেমন ফরাসিতে মধ্য স্বরপ্রণব, বাংলায় মুর্ধণ্য ব্যঞ্জন প্রণব, বান্টু ভাষার ক্লিক প্রণব) চমৎকার কাজ চলে যায়?

কার্ল পপার দাবি করেছেন, বিজ্ঞান বলে বিবেচিত হতে হলে সাধারণীকরণের সময় অবশ্যই অবরোহী পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। 'চমস্কি মরণশীল, হালে মরণশীল... সুতরাং মানুষ মরণশীল' হচ্ছে আরোহী পদ্ধতি। 'মানুষ মরণশীল, সুতরাং চমস্কি মরণশীল' হচ্ছে অবরোহী পদ্ধতি। সূত্র রচনাকে আমরা আরোহী পদ্ধতির সাথে তুলনা করতে পারি। প্রতিবন্ধ (Constraint) রচনাকে তুলনা করা যায় অবরোহী পদ্ধতির সাথে। 'অমুক প্রতিবেশে [+মহাপ্রাণ] প্রণবের অস্তিত্ব অসম্ভব' বলা ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধের উদাহরণ। সিংহ (১৯৮৪) বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখিয়েছেন যে প্রতিবন্ধ ব্যবহৃত হলে সূত্র ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই। (১) ও (২) এর মতো সূত্রের মাধ্যমে ধ্বনিপরিবর্তনের বর্ণনা দিলে কৃচ্ছতার শর্ত পূরণ হয় না।

ধ্বনিপরিবর্তনের সঞ্জননী সূত্রগুলো ব্যতিক্রমহীন নয় এবং চমস্কি ও হালে দাবি করেন যে ধ্বনিপরিবর্তনের যে কোনো সূত্রেরই ব্যতিক্রম থাকতে পারে। আসলে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রগুলোরই ব্যতিক্রম থাকে, প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ ধ্বনিপরিবর্তন সূত্রের কোনো ব্যতিক্রম থাকে না। রূপধ্বনিতত্ত্বকে ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করলেই ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র মাত্রেরই ব্যতিক্রম থাকার ঘোষণা দেবার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয় যা বর্ণনার কৃচ্ছতা ও যাথার্থ্যের জন্যে হানিকারক।

৭. সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের উত্তরাধিকার

সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের বিবিধ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে ফনোলজির একাধিক তত্ত্বের সূচনা হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে Natural Generative Phonology। তত্ত্বটি মূলত থিও ফেনমেনের, তবে ওঁর ছাত্রী হুপার বাইবি (১৯৭৬) তত্ত্বটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই মডেলে কোনো অন্তর্লীণ স্তর নেই। ফনোলজিক্যাল অভিজ্ঞানের সাথে ফোনেটিক অভিজ্ঞানের অনেকটাই সাদৃশ্য আছে। ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র তিন রকম: ১) P-rule (যে নিয়মগুলোর কোনো ব্যতিক্রম নেই, যেমন ১নং নিয়ম), ২) M(orpho)P(honemic)-rule (রূপতাত্ত্বিক প্রতিবেশে এ নিয়মগুলোর কোনো ব্যতিক্রম নেই, যেমন ২নং নিয়ম) এবং ৩) Via-rule (এ নিয়মগুলোর ব্যতিক্রম আছে, যেমন ox/oxen, যাই/গিয়েছি)।

আর একটি তত্ত্ব হচ্ছে Generative Phonotactic যার প্রবক্তা ফ্রিমেন টডেলের ছাত্র রাজেন্দ্র সিংহ (1984, 1990)। এই তত্ত্বেও সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের মতো অন্তর্লীণ স্তর ও ভূমিস্তরের অস্তিত্ব রয়েছে; এই তত্ত্বেও ব্যবহৃত হয় স্বলক্ষণ। তবে ধ্বনিপরিবর্তন সূত্রের পরিবর্তে এই মডেলে ধ্বনিতাত্ত্বিক **সুগঠন শর্ত** (Well-formedness condition) ব্যবহার করা হয়। কোন সুগঠন শর্ত লঙ্ঘন করা যায় না। যদি কোনো অন্তর্লীণ প্রণবক্রম কোনো ভাষার কোনো একটি সুগঠন শর্ত ভঙ্গ করে তবে সে প্রণবক্রমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেরামত হয়ে যায়। মেরামতের তিনটি সার্বজনীন (বা বিশ্বজনীন) কৌশল (Strategy of repair) রয়েছে: ১. **প্রতিস্থাপন** (Substitution) অথবা **সমীভবন** (Assimilation),২.**স্বরভক্তি** (Epenthesis) এবং ৩. **ধ্বনিলোপ** (Deletion)। সংশ্লিষ্ট ধ্বনিক্রমের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবেশ আর সংশ্লিষ্ট ভাষার মর্জির উপর নির্ভর করে এই তিনটি মেরামত-কৌশলের যে কোনো একটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়। নিচে সুগঠন শর্তের একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

সুগঠন শর্ত-১	
***সূচনা**	
ব্যঞ্জন-১	ব্যঞ্জন-২
[+ শীষ]	

উপরের সুগঠন শর্তটির ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে অক্ষরের সূচনায় কোনো শীষ ব্যঞ্জন-প্রণব ('শ' বা 'স') অন্য কোন ব্যঞ্জন প্রণবের সাথে মিলিত হয়ে **ধ্বনিখণ্ড** (Cluster)গঠন করতে পারবে না। অর্থাৎ অক্ষরের সূচনায় এমন দু'টি ব্যঞ্জন প্রণব থাকতে পারবে না যার প্রথমটি একটি শীষ প্রণব। ধরা যাক, কোনো বাংলাভাষীর ধ্বনিতাত্ত্বিক মডিউলে এই সুগঠন শর্তটি রয়েছে। সেই বাংলাভাষীর অন্তর্লীণ স্তরে যদি ইংরেজি School শব্দটি থাকে তবে সেই বাংলাভাষী অপিনিহিতির মধ্যেমে সেটিকে উচ্চারণযোগ্য করে নেবে– উচ্চারণ করবে 'ইস্কুল' বা 'ইশকুল'। একজন পাঞ্জাবি-ভাষী যখন School শব্দটি উচ্চারণ করতে যায় তখন শব্দটি ভূমিস্তরে হয়ে যায় 'সকুল'। নিউজিল্যান্ডের ভাষা ওয়ালপিরিতে School শব্দটি ধ্বনিলোপের মাধ্যমে 'কুল' হয়ে যায়, কারণ ওয়ালপিরির প্রাণবিক বর্ণমালায় 'স' প্রণবটিই নেই এবং ওয়ালপিরির ধ্বনিতত্ত্ব অক্ষরের সূচনায় কোন প্রকার ব্যঞ্জন-প্রণবগুচ্ছ অনুমোদন করে না।

রাজেন্দ্র সিংহ (1984) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এলান প্রিন্স, পল স্মোলেনস্কি, কাগের, জন ম্যাকার্থি প্রমূখ ধ্বনিবিজ্ঞানীর প্রস্তাবিত (দ্রষ্টব্য: Archangeli, 1997) Optimality theory-তেও (যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে: 'নির্বাচনবাদী তত্ত্ব') ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রের বদলে ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধ ব্যবহার করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রতিবন্ধগুলোর একটি বিশ্বজনীন তালিকা আছে যার নাম হতে পারে **সংবরণ** (Con)। এ ছাড়া আছে দু'টি প্রক্রিয়া: **সৃজন** (Gen) আর **মুল্যায়ণ** (Eval)। সৃজনের কাজ ভূমিস্তরে উন্নীত হতে ইচ্ছুক এমন বহুসংখ্যক প্রার্থী সৃষ্টি করা। নিচের ১নং তালিকায় 'বাঘ', 'বাক', 'বাগ' ইত্যাদি এ রকম কিছু প্রার্থীর উদাহরণ। মুল্যায়ণের কাজ এই প্রার্থীদের মধ্যে শুধু একজনকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া।

নির্বাচনী প্রার্থী-তালিকা-১							
যোগান/অন্তর্লীন স্তর: বাঘ							
চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থী	প্রার্থী ক্রমিক নং	মনোনয়ণ প্রার্থীর তালিকা	প্রতিবন্ধ ১	প্রতিবন্ধ ২	প্রতিবন্ধ ৩	প্রতিবন্ধ ৪	প্রতিবন্ধ ৫
			অখণ্ডতা	অবিভাজ্যতা	উপধায় মহাপ্রাণতা লোপ	উপধায় ঘোষতা-লোপ	বিশ্বস্ততা/অভিন্নতা
	১	বাঘ			*!		
	২	বাক				*	*
☞	৩	বাগ					*
	৪	বা	*!				*
	৫	বাঘো		*!			*
	৬	ঘাব!	*			*	*

কে পাবে চূড়ান্ত মনোনয়ন? ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধগুলোর মধে কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি বা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ (যে প্রতিবন্ধ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার ডানদিকে (!) চিহ্ন দেয়া হয়)। 'সংবরণ' একটি বিশ্বজনীন প্রতিবন্ধ-তালিকা কিন্তু প্রতিবন্ধগুলোর গুরুত্বানুক্রম সব ভাষায় এক নাও হতে পারে, অর্থাৎ কোন ভাষায় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবন্ধ অন্য একটি ভাষায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। বাংলা ভাষায় গুরুত্বের ক্রমানুসারে ১নং তালিকায় কয়েকটি প্রতিবন্ধকে সাজানো হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, কেন 'অখণ্ডতা' প্রতিবন্ধটি 'উপধায় ঘোষতা-লোপ' এর তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অথবা কেনইবা 'অবিভাজ্যতা' (অর্থাৎ একাক্ষর শব্দকে ভেঙ্গে দ্ব্যক্ষর শব্দে পরিণত করতে না পারা) অন্য প্রতিবন্ধ 'উপধায় ঘোষতা-লোপ' এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ? অখন্ডতার প্রতিবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ১নং প্রার্থী-তালিকার ৪নং প্রার্থী যেমনটি করেছে (বাঘ > বা), বাংলায় কখনই সেভাবে উপধা লোপ হয় না। এই 'বা' প্রার্থীটি 'বাঘ' এর অন্তর্লীণ কাঠামো এতটাই নষ্ট করেছে যে তাকে আর 'বাঘ' বলে চেনাই যাচ্ছে না। বাংলায় সাধারণত উপধায় ঘোষতার অবসান হয় না

কিন্তু উপধায় মহাপ্রাণতা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লোপ পায়। বাংলায় আমরা 'ভাব' বা 'ভাগ' বলতে গিয়ে *'ভাপ' বা *'ভাক' বলি না (যদিও 'আজকে' বলতে গিয়ে অনেকে 'আচকে' বা 'মাঝপথে' বলতে গিয়ে 'মাছপথে' বলে থাকেন)। কিন্তু 'লাভ' বা 'বাঘ' বলতে গিয়ে অতিসতর্ক না হলে 'লাব' বা 'বাগ' বলার সম্ভাবনা 'মাছপথে' বলার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। এ কারণেই 'উপধায় মহাপ্রাণতা লোপ' প্রতিবন্ধটি 'উপধায় ঘোষতা লোপ' এর তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে উপধার প্রণবের স্বলক্ষণ বদলে যাওয়া অসম্ভব নয় যেমন, বাঘ > বাগ। অবিভাজ্যতার প্রতিবন্ধটি বিশ্বস্ততার তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে অবিভাজ্যতা আছে ২ নম্বরে এবং অভিন্নতা আছে ৫ নম্বরে। অবিভাজ্যতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধ বলে কোন প্রার্থী এই প্রতিবন্ধ অমান্য করলে অবিভাজ্যতার খোপে (!) চিহ্ন দেয়া হচ্ছে।

নির্বাচনবাদী তত্ত্বে প্রতিবন্ধের গুরুত্ব ও সংখ্যা এই দুইই বিবেচনা করতে হবে। যে প্রার্থী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবন্ধ অমান্য করবে সে প্রার্থী প্রথমেই বাতিল হবে। যে প্রার্থী একাধিক প্রতিবন্ধ অমান্য করবে সেও বাতিল হতে পারে। সেই প্রার্থীই চূড়ান্তভাবে মনোনীত হবে যে সবচেয়ে কমসংখ্যক এবং/বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধ অমান্য করবে। ১নং তালিকায় ৩য় প্রার্থী 'বাগ' চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছে কারণ সে একটি মাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধ (৫নং) 'বিশ্বস্ততা' অমান্য করেছে। 'বাঘ' প্রথমেই বাদ পড়ে গেছে কারণ সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবন্ধ (৩নং) অমান্য করেছে যদিও সে অন্তর্লীণ স্তরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে। 'বাক' নির্বাচিত হয়নি, কারণ সে দুই দু'টি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধ (৪ ও ৫ নং) অমান্য করেছে, যেখানে 'বাগ' অমান্য করেছে একটিমাত্র প্রতিবন্ধ। 'বা' আর 'বাঘো' এই দুই প্রার্থীর কোনটিই নির্বাচিত হতে পারেনি কারণ তারা প্রত্যেকে দু'টি করে (একটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ) প্রতিবন্ধ অমান্য করেছে।

উপরের একটি মডেলেও বলা হচ্ছে না কেন 'বাঘ' শব্দের উচ্চারণ 'বাগ' হচ্ছে। ডেভিড স্ট্যাম্পের **প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব** এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। স্ট্যাম্প (১৯৭৯) এবং ডোনেগান ও স্ট্যাম্প (১৯৭৯) দাবি করেন, অনেক ভাষাতেই অক্ষরের উপধায় উষ্মতা থাকে না। কেন থাকে না? থাকে না কারণ ঊনবিংশ শতক থেকেই ধ্বনিবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, প্রতিটি অক্ষর হচ্ছে এমন একটি কাঠামো যাতে বিভিন্ন অবস্থানে রণন (Sonority) অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর কম্পন এক থাকে না। রণন বা স্বরতন্ত্রীর কম্পন তীব্র হতে শুরু করে অক্ষরের সূচনায়, অক্ষরের কেন্দ্রে গিয়ে সেই কম্পন তীব্রতম হয় এবং তার পর কম্পন হ্রাস পেতে শুরু করে এবং অবশেষে উপধায় এসে কম্পন ক্ষীণতম পর্যায়ে পৌঁছায়। সুতরাং অক্ষরের সূচনায় মহাপ্রাণ ও ঘোষপ্রণব স্বাভাবিক কিন্তু উপধায় এগুলো অস্বাভাবিক। স্ট্যাম্প দাবি করেন, অক্ষরের সূচনায়, কেন্দ্রে, উপধায় বা দুই অক্ষরের অন্তবর্তি স্থানে যে প্রণব বা প্রণবক্রম উচ্চারণ করা সহজসাধ্য নয় সেগুলো উচ্চারণ না করা একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। যেমন অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা অবসান হওয়া একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াটি মানুষকে শিখতে হয় না।

মানুষকে যা শিখতে হয় তা হচ্ছে এই যে কোন কোন প্রতিবেশে এই প্রক্রিয়াটিকে অমান্য করতে হবে। যেমন ইংরেজিভাষী শিশুকে Bath বা Faith শব্দে অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় রাখাটা খেয়াল করে শিখতে হয়। বাংলা অক্ষরের অন্তে যে মহাপ্রাণতার অবসান হয় তা বাঙালি শিশুর শেখার প্রয়োজন নেই। প্রমিত বাংলাভাষী শিশুকে শিখতে হয় কিভাবে 'সব', 'বাদ', 'রাগ' ইত্যাদি শব্দে অক্ষরের উপধায় ঘোষতা বজায় রাখতে হবে। জার্মান শিশুকে এ ব্যাপারটা শিখতে হয় না। 'চাকা' এর জার্মান প্রতিশব্দ Rad-এর উচ্চারণ 'রাট' কারণ জার্মান ভাষায় অক্ষরের উপধায় ঘোষতার অবসান হয়। আবার ইংরেজিভাষী শিশুকে এ ব্যাপারটি শিখতে হয় কারণ ইংরেজিতে অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় থাকে (উদাহরণ: Red, Read, Rod)।

৮. উপসংহার

খ্রিস্টপূর্ব যুগের বৈয়াকরণ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর পর ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে ধ্বনিতত্ত্বের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বিকশিত কাঠামোবাদী ধ্বনিতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে ষাটের দশকের শেষে নোয়াম চমস্কি ও মরিস হালের হাতে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের উদ্ভব হয়। এর পর সঞ্জননী ঘরানার ভিতরের ও বাইরের ধ্বনিবিজ্ঞানীরা সত্তর ও আশির দশকে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন এবং সেগুলোর সমাধানকল্পে কয়েকটি বিকল্প মডেলের প্রস্তাব করেন। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে বর্তমান প্রবন্ধে ধ্বনিতত্ত্বের বিকাশের এই সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, Anderson (1985) পুস্তকটি বর্তমান প্রবন্ধে তথ্যের অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সহায়ক রচনা

Anderson, Stephen, R. (1985) *Phonology in the Twentieth century*, The University of Chicago Press, Chicago.

Chomsky, Noam and Halle, Moris (1968) *Sound Pattern of English*. Harper & Row, Publishers, New York.

Godel, Robert (1957) *Les sources manuscrits du cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure*. Librairie Droz, Geneva.

Harris, Zellig (1942) Morpheme Alternations in Linguistic Analysis, *Language* 18 :169-80.

Hooper, Joan B. (1976) *An Introduction to Natural Generative Phonology*. Academic Press, New York.

Jensen, John, T. (2004) *Principles of Generative Phonology: An Introduction*. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam.

Kiparsky, Paul (1982) How abstract is phonology, *Explanations in Phonology.* Foris Publications, New York.

Singh, Rajendra (1984) Well-formedness Conditions and Phonological Theory. In W. Dressler et al. (eds.), *Phonologica*. Cambridge Univerisity Press, Cambridge.

Singh, Rajendra (1996) Explorations in Phonology and Morphology. In S. K. Verma and D. Singh (eds.), *Perspectives on Language in Society (Papers in memory of Prof.* Srivastava). Kalinga Publications, New Delhi.

Sommerstein Alan, H. (1977) *Modern Phonology*. Edward Arnold, London.